Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

www.bdplatform4sdgs.net
www.facebook.com/BDPlatform4SDGs/

ব্রিফিং নোট- ১

(১৮ এপ্রিলের মিডিয়া ব্রিফিংয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে)

পটভূমি

সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ যে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে, তা মোকাবেলায় এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশের অংশীদারেরা সহযোগীদের নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ২০১৬ সালে গঠিত এই প্ল্যাটফর্মে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরের শতাধিক সংগঠন, নেটওয়ার্ক ও তাদের সহযোগীরা কাজ করছে। এরা হলো, বেসরকারি খাত, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও), সামাজিক সংগঠন (সিবিও), গণমাধ্যম কর্মী, গবেষণা কেন্দ্র, চিন্তক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য পেশাজীবী।

এই প্ল্যাটফর্মের দু'টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে কাজ শুরু করে। বিশেষ করে কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে তথ্য প্রচার করে তারা এই সংকট সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করছে। অন্যান্য অধিকাংশ সহযোগী প্রতিষ্ঠান ২০২০ সালের মার্চ মাসের মধ্যভাগে মহামারির প্রভাব দৃশ্যমান হওয়ার পর এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে।

তারা যেসব ক্ষেত্রে কাজ করছে (গুরুত্ব অনুসারে) সেগুলো হলো যথাক্রমে: সচেতনতা, খাদ্য নিরাপত্তা, ওয়াশ (পানি, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি), স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, কৃষি, সরাসরি নগদ সহায়তা, আশ্রয়, আইনি সহায়তা, ত্রাণ বিতরণে স্বচ্ছতা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ, আক্রান্ত মানুষদের পরিবহন, সেবা ও পুনর্বাসন। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্ল্যাটফর্মের অংশীদারেরা যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে তার মধ্যে একটি হলো, সরকারের উদ্যোগের সঙ্গে ভুক্তভোগীদের সংযোগ ঘটানো। এদের মধ্যে অনেকেই আবার রোহিঙ্গা শিবিরে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যুক্ত আছে।

এই প্রক্রিয়ায় প্ল্যাটফর্মের অংশীদারেরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পেরেছে। এদের মধ্যে আছে শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষ, নারী, দুর্গম এলাকার মানুষ, শিশু, আদিবাসী, দিনমজুর, যুবক, দলিত সম্প্রদায় ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, বয়স্ক নাগরিক, ভাসমান সম্প্রদায় ও পেশাগত দিক থেকে সংখ্যালঘু মানুষ যেমন, যৌন কর্মী ও ময়লা সংগ্রাহক ইত্যাদি।

ঢাকা, রংপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, খুলনা ও সিলেট বিভাগে (কাজের ঘনত্ব এবং গুরুত্ব অনুসারে) প্ল্যাটফর্মের সহযোগী প্রতিষ্ঠানরা তাদের এই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আর প্রাথমিকভাবে ৪০টি প্রতিষ্ঠানের ভাষ্য অনুসারে জানা গেছে, কোভিড-১৯ মোকাবেলার লক্ষ্যে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রায় ছয় শতা কোটির অধিক টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে তারা।

এই ব্রিফিং নোটটি নাগরিক প্ল্যাটফর্মের সহযোগী প্রতিষ্ঠান, কোর গ্রুপের সদস্যদের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের সারসংক্ষেপ। প্ল্যাটফর্মের শতাধিক সহযোগী প্রতিষ্ঠানরা দেশজুড়ে তৃণমূল পর্যায়ে কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় সক্রিয়ভাবে জড়িত। এই ব্রিফিং নোটটি করোনভাইরাস মোকাবেলায় কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা যে ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে তা নিরসনে নীতি সাহায্যের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তুলে ধরেছে। সেই সাথে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের সহযোগী প্রতিষ্ঠানরা গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের পাশাপাশি কোভিড -১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় কি কি জরুরী নীতিমালা প্রয়োজন সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

১. এসডিজি বাস্তবায়নে কোভিড-১৯-এর প্রভাব

মহামারি এখনো শেষ হয়নি, ফলে তার আরও রূপ আমাদের দেখা বাকি। তাৎক্ষণিকভাবে আমরা এর কিছু প্রভাব দেখছি। এটা পরিস্কার যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম, সামাজিক সংহতি, পরিবেশগত স্থায়ীত্ব ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এই কোভিড-১৯-এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়বে। আবার এটাও সম্ভব যে, এই অভূতপূর্ব মহামারির কারণে দেশে অসমতা ও বৈষম্য আরও বেড়ে যাবে। সমাজে অনেক মানুষই পিছিয়ে আছেন; এই প্রক্রিয়ায় সেই মানুষেরা আরও অরক্ষিত হয়ে পড়তে পারেন - এমন আশঙ্কাও অমূলক নয়। ফলে এসডিজি বাস্তবায়নের প্রথম ধাপে (২০১৫-২০) যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, তা ব্যাহত হতে পারে। এই অবস্থায় দেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা- ২০৩০ বাস্তবায়নে কোভিড-১৯-এর কী প্রভাব পড়বে, তা মূল্যায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে এই প্ল্যাটফর্ম। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও জীবিকা বিষয়ক নানা ব্যবস্থা নিচ্ছে। প্ল্যাটফর্ম মনে করছে, সরকারের এসব কার্যক্রম এসডিজি ২০৩০-এর অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে করা উচিত। এ ছাড়া কোভিড-১৯-উত্তর জাতীয় পুনরুদ্ধার কর্মসূচি প্রণয়নে এসডিজি-২০৩০-এর নীতিগত কাঠামো সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২. রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সরকারের কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতনামূলক প্রচারণায় যুক্ত করা

২.১. এই কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকার যে জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে তাতে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়নি। এরা হলো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংগঠন, এনজিও, অধিকারভিত্তিক সংগঠন ও কর্মী, নীতি বিশেষজ্ঞ ও গণমাধ্যম কর্মী, প্রভৃতি। এই জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় তারা সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পারে। অর্থনীতি ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই সব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের যোগাযোগ আছে। তাই সরকার ও জনগণের মাঝে তারা কার্যকর যোগাযোগ ঘটাতে পারত। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে এইসব প্রতিষ্ঠানের কিছু যোগাযোগ হচ্ছে তা ঠিক, কিন্তু এই ব্যাপারে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নীতিগত ঘোষণা আসা দরকার। জাতীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে এই আলোচনা করা যেতে পারে। এই ধরনের আলোচনা সরকার গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ আরও শক্তিশালী করতে পারে।

২.২. অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরে অনেক প্রতিষ্ঠান এই কোভিড-১৯ মোকাবেলায় কাজ করছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় প্রশাসনকে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিতে হবে, যাতে তারা এদের সহযোগিতা করে। বঞ্চিত মানুষের যে তালিকা তারা তৈরি করছে তাতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে স্থানীয় সরকারকে। এ ছাড়া সরকারি উদ্যোগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার যেন এইসব প্রতিষ্ঠানসহ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা করে, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিতে হবে।

৩. স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্ব কোথায় দিতে হবে তার রূপরেখা নির্ধারণ

এনজিওরা যে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কর্মসূচি চালাচ্ছে, সেই ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে, এর মধ্যে খাদ্য বিতরণও আছে। তবে মুখে মাস্ক ব্যবহার করা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া বা সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার মতো সচেতনতামূলক কর্মসূচির বাইরে স্থানীয় প্রশাসনকে অনুধাবন করতে হবে যে, এই পরিস্থিতির টেকসই

পরিবর্তনে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, শিশুর অধিকার, কৈশোরের চ্যালেঞ্জ, জন নিরাপত্তা - এসব বিষয়েও মানুষের সচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার। এ ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানগুলো আরও যা করতে পারে তা হলো, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের তড়িৎ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে ঝুঁকি চিহ্নিত করা।

৪. অংশীদারত্বের মাধ্যমে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় কার্যক্রম পরিচালনা

এনজিওগুলো কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আমরা মনে করি, সরকার যদি নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে তাদের সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করে, তাহলে এই তৎপরতা আরও গতি পাবে:

- স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রচারণা
- সরকারের প্রণোদনা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি
- বঞ্চিত মানুষের তালিকা তৈরি
- বাড়ি বাড়ি ত্রাণ বিতরণ
- অরক্ষিত পরিবারগুলোর হাতে নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়া

৫. তৃণমূল পর্যায়ে ডিজিটাল আর্থিক সেবা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি

মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা লেনদেন ব্যাপক হারে বেড়েছে। সরকারও প্রণোদনার অর্থ এই মাধ্যমে সরাসরি সুবিধাভোগীদের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার এনজিওদের সহযোগিতা নিয়ে জরুরিভিত্তিতে তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং সাক্ষরতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে।

মায়েদের মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি ও নগদ সহায়তা দেওয়ার যে কর্মসূচি চালু রয়েছে, বিদ্যমান সেই মাধ্যম ব্যবহার করেও মানুষের কাছে অর্থ সাহায্য পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে।

৬. স্থানীয় জনগণের কাছে পৌঁছাতে কমিউনিটি রেডিওর সুনির্দিষ্ট ব্যবহার

দেশে কমিউনিটি রেডিওর বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে। এই নেটওয়ার্ক ইতিমধ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, তবে এটির আরও সুনির্দিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জোরদার প্রচারণা চালানো যায়। যেমন, সরকারের প্রণোদনা সম্পর্কে বোঝাপড়া বৃদ্ধি, জীবিকা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান, জরুরি ঘোষণা দেওয়া, ইত্যাদি।

৭. বঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছানো

৭.১ এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়, অরক্ষিত মানুষেরা আবারও কোনো না কোনাভাবে বাদ পড়ে যাচ্ছে। এদের অনেকের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নেই। ফলে নগদ টাকা সরবরাহসহ সরকার যেসব প্রণোদনা দিচ্ছে, তারা অনেকেই তা নিতে পারছে না। অনেকে আবার নামমাত্র ভাতা পান। সে জন্য তারা এখন সরকার-ঘোষিত সহায়তা পাচ্ছেন না। এদের অনেকেই দুর্গম এলাকায় থাকেন।

সামাজিক সমস্যার কারণেও অনেক মানুষ এইসব সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হন। এ ক্ষেত্রে সরকারের নীতি-স্বচ্ছতা দরকার।

৭.২ এসব গোষ্ঠীর মধ্যে যারা আছে তারা হলো, যাদের বসবাসের নিরাপদ জায়গা নেই - যেমন ভাসমান মানুষ (গৃহহীন), ফুটপাত ও অন্যান্য খালি জায়গায় বসবাসকারী, বস্তিতে বসবাসকারী মানুষ, ইত্যাদি। তাদের জাতীয় পরিচয়পত্রও নেই।

৭.৩ আরও যেসব মানুষ পিছিয়ে আছে বা বাদ পড়ে যাচ্ছে, তারা মূলত পরিচয় ও পেশাগত কারণে পিছিয়ে পড়ছে। এদের মধ্যে আছে সমতল ও পাহাড়ের আদিবাসী (জাতিগত সংখ্যালঘু), দলিত, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, হিজড়া, যৌনকর্মী, বেদে, কারিগর ও জেলে সম্প্রদায়।

৭.৪ শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম মানুষেরাও সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়। এদের আবার সচেতনতামূলক উপকরণ পাওয়ার সম্ভাবনাও কম, কারণ এগুলো তাদের কথা চিন্তা করে তৈরি করা হয়নি। এই শ্রেণির মানুষের দোরগোড়ায় খাদ্য সহায়তা নিয়ে যাওয়া জরুরি।

৭.৫ জলবায়ু-পরিবর্তনে আক্রান্ত অঞ্চলে বসবাসরত মানুষও 'পিছিয়ে আছে'। চরাঞ্চল ও অন্যান্য দুর্গম এলাকার মানুষের বেলায় এই কথা প্রযোজ্য। হাওর অঞ্চলের মানুষও সেবা বঞ্চিত, যেখানে এখন ফসল কাটা শেষের দিকে।

৭.৬ দেশের অনেক শিশু পালক-অভিভাবকের কাছে বড় হচ্ছে। এই অভিভাবকদের মধ্যে অনেকেই এখন কর্মহীন, তাদের সহায়তা দেওয়া উচিত।

৭.৭ গৃহফেরত অভিবাসীরা সমাজে নানা হয়রানির শিকার হচ্ছে। মানুষ তাদের একঘরে করে রাখছে। তাদেরও সহায়তা প্রয়োজন।

৭.৮ পরিবার-বিচ্ছিন্ন ও সামাজিক সহায়তাহীন বয়স্ক মানুষেরাও অত্যন্ত অরক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

- অনেক এনজিওর এইসব জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। সরকার যদি এই এনজিওদের সঙ্গে কাজ করে, তাহলে সরকার এই জনগোষ্ঠীর কাছে সহজে পৌঁছাতে পারবে। এদের চাহিদাও যথাযথভাবে আমলে নিতে পারবে।
- এইসব অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকার বেশ কিছু সংস্থা গঠন করেছে (যেমন, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন)। তবে তাদের কার্যক্রম এখন দৃশ্যমান নয়। সরকারের ত্রাণ কর্মসূচির সঙ্গে এইসব সংস্থাকে কার্যকরভাবে যুক্ত করতে হবে।

৮. জীবন বাঁচানোর সঙ্গে জীবিকার সমন্বয়

৮.১ এই সময়ের মূল কাজ হচ্ছে, মানুষের জীবন বাঁচানো। বিজ্ঞান বলছে, জীবন বাঁচানোর সবচেয়ে কার্যকর পথ হচ্ছে সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করা। তাই কোয়ারেন্টিন, বিচ্ছিন্নকরণ, লকডাউন - এসব অবহেলা করার সুযোগ নেই। নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, তার অংশীদার ও সহযোগীরা এইসব জীবনরক্ষাকারী ব্যবস্থা গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ।

৮.২ পরিস্কারভাবেই দেখা যাচ্ছে, লকডাউন দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে বিভিন্ন স্তরের পিছিয়ে পড়া মানুষ জীবিকা নির্বাহে গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে, বিশেষ করে তারা যাদের উপার্জনের নিশ্চয়তা নেই। এই মানুষদের মধ্যে আছে দিনমজুর (নির্মাণ ও পরিবহন কর্মী), কারখানার কাজ হারানো কর্মী (লেইড অফ), গৃহফেরত অভিবাসী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের উদ্যোক্তা, নিম্নবেতনের কর্মী, ইত্যাদি। এই পরিস্থিতিতে বেকারত্ব উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। আর নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর আয় কমে যাওয়ায় তাদের যেমন ধার করে ব্যয় করতে হচ্ছে, তেমনি সেই ধার মেটাতে গচ্ছিত সম্পদ বিক্রি করতে হচ্ছে। পরিণামে তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছে। সরকার যে আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, তাতে এই মানুষের বিশেষ কাজ হচ্ছে না, কারণ ওই ১০ টাকা কেজি দরে চাল কেনার সামর্থ্যও তাদের নেই। সেকারণে তথাকথিত নিম্ন-মধ্যম শ্রেণির মানুষেরা চরম অর্থনৈতিক দুর্দশায় পতিত হয়েছে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারকে তাই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে নগদ সহায়তা পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। আর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

৮.৩ যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সরবরাহ ব্যবস্থা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ শিকার হয়েছেন কৃষকেরা, বিশেষত, উত্তরবঙ্গের কৃষকেরা। তারা যেমন একদিকে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না, তেমনি রাজধানীর বাজারে এসব পণ্য উচ্চদামে বিক্রি হচ্ছে। এতে কৃষি উদ্যোক্তাদের আর্থিক সক্ষমতা বিনষ্ট হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সীমিত পরিসরে হলেও সরকারকে জরুরিভিত্তিতে কৃষি পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করতে সামরিক পরিবহন ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারে। বলা বাহুল্য, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮.৪ ক্ষুদ্র ঋণের ব্যাপারে সরকারের যে মনোভাব, তা এই মুহূর্তে পর্যালোচনা করা যেতে পারে, বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থ সঞ্চালনের পরিপ্রেক্ষিতে। বেশ কিছু অর্থনৈতিক কাজে অর্থায়নের প্রয়োজন হবে, এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরেও অর্থ যোগানের ব্যবস্থা করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে ঈদের সময় চামড়া ক্রয়ের কথা বলা যায়। এই অবস্থায় খাতভিত্তিক বাণিজ্য সংগঠনের (বেসরকারি খাত) কাছ থেকে তথ্য নিয়ে তথ্যভান্ডার তৈরি করা জরুরি।

৮.৫ ব্যবসা-বাণিজ্যে যে শ্লথগতি দেখা যাচ্ছে, সেই প্রেক্ষিতে কর্মীদের চাকরির সুরক্ষা দেওয়া বেসরকারি খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সরকার যে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, তথ্যের অভাবে তা ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি খাতের কাছে পৌঁছানো কঠিন। এই উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য আবার সরকারকে বেসরকারি খাতের সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সঙ্গে অংশীদারি করতে হবে।

৯. আসন্ন দুর্যোগ

৯.১ প্রথম কথা হচ্ছে, এই কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে স্বাস্থ্যকর্মীরা সম্মুখ সারিতে লড়াই করছেন, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সবচেয়ে জরুরি। কিন্তু প্যারামেডিক, টেকিনিশিয়ান ও সেবাদাতারা অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না।

৯.২ মানবজাতি যখন চরম দুর্যোগের কবলে পড়েছে, তখন আমরা দেখছি, গৃহে নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়ে যাচ্ছে। হেল্পলাইন চালু থাকলেও নির্যাতিতদের আশ্রয় কেন্দ্র বন্ধ আছে। এই পরিস্থিতিতে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে স্থানীয় প্রশাসনকে এই কঠিন সময়ে ভুক্তভোগীদের নিয়ে কী করতে হবে - এই বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিতে হবে।

৯.৩ এই মহাদুর্যোগে আরেকটি উদ্বেগের কারণ হলো, স্কুল থেকে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধির আশঙ্কা, বিশেষ করে মেয়েদের। এর সঙ্গে বাল্য বিবাহ, অল্প বয়সে গর্ভধারণ ও শিশু শ্রম বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে। সরকারকে এখন থেকেই এই বিষয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যদিকে টেলিভিশনের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে শিক্ষাদান চলছে, এই প্রক্রিয়া আরও বড় পরিসরে নিয়ে যেতে হবে।

৯.৪ মহামারির আরেকটি প্রতিক্রিয়া হিসেবে মৌলিক খাদ্য প্রাপ্তি কঠিন হয়ে যেতে পারে, বিশেষ করে অরক্ষিত শ্রেণির পক্ষে। অপুষ্টির হার বেড়ে গেছে। এই শ্রেণির মানুষের খাদ্যপ্রাপ্তি বিঘ্নিত হতে পারে, এমন আশঙ্কাও আছে। এই পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তা কৌশল পর্যালোচনা করতে হবে।

৯.৫ এই দীর্ঘ লক ডাউনের মধ্যে দেশের তরুণদের একটি অংশ নেশাগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদেও দিকে ঝুঁকতে পারে এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারকে সামাজিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০. রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরের প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থায়ন

১০.১ এই মুহূর্তে তহবিলের অভাবে এনজিওদের তৎপরতা ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকার বাইরে ছোট ছোট যেসব এনজিও কাজ করছে, যারা ক্ষুদ্র ঋণের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাদের বেলায় এই কথা বিশেষভাবে সত্য। অন্যদিকে ঋণের কিস্তি তোলার মতো বাস্তবতা না থাকায় ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী এনজিওগুলো শিগগিরই চাপের মুখে পড়বে।

১০.২ বিপুল সংখ্যক এনজিও বাহ্যিক অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল। এই বিশেষ বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে তারা সম্প্রতি কর্মসূচি পুনর্গঠন করেছে। বাইরের তহবিলদাতারা এই কর্মসূচিগত পরিবর্তনের ব্যাপারে বরাবরই ইতিবাচক। তবে এখন তারা কিছু স্বাস্থ্য-বিষয়ক তৎপরতায় সমর্থন দিলেও জীবিকা-বিষয়ক কর্মসূচিতে সমর্থন দিচ্ছে না।

১০.৩ আমাদের নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য সব সময় এসডিজি ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের কথা বলে আসছে। এখন এই তহবিলের প্রয়োজনীয়তা আরও তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। মহামারি ও পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় তাই এই ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়েছে।

১১. অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও সামাজিক নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা

১১.১ নাগরিক প্ল্যাটফর্মের যে সদস্যরা কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যুক্ত আছেন, প্ল্যাটফর্ম তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সুনির্দিষ্টভাবে নথিভুক্ত করছে। এতে অংশগ্রহণকারীদের কর্মসূচির অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন করতে পারছে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম। মাঠে নেমে তারা কী ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জর মুখে পড়েছেন, তাও বুঝতে পারছে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম। পারস্পরিক শিক্ষণ নিশ্চিত করতে প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালানাগাদ করা হচ্ছে (দেখুন: https://bdplatform4sdgs.net)

১১.২ কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যেসব এনজিও কাজ করছে, তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার পদ্ধতি তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে; যাতে অন্যান্য কাজের সঙ্গে সমন্বয় প্রক্রিয়া জোরদার হয়, একই কাজ যেন একাধিক সংস্থা না করে তা নিশ্চিত করা, দুর্গত এলাকা ও জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো, উত্তম রীতিনীতির অনুসৃত হওয়া নিশ্চিত করা ও পারস্পরিক শিক্ষণের পরিবেশ তৈরি করা যায়। এই ধরনের চর্চার প্রসার ঘটানোর জন্য প্ল্যাটফর্ম উদ্যোগ নেবে।

১১.৩ প্রান্তিক ও অরক্ষিত মানুষের জন্য সরকার অর্থ ও সম্পদ বরাদ্দ দিয়েছে। সরকার স্বাভাবিকভাবেই জানতে চাইবে, এইসব উদ্যোগ কতটা কার্যকর হচ্ছে। প্ল্যাটফর্ম তার অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে সেরকম একটি সামাজিক নিরীক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের চেষ্টা করবে।